



Vol. 26 | No. 1 | 1982



সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্যরীতি

Volume	26
Issue	1
Year	1982
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মাহবুব সাদিক
Published online	December 1, 1982
DOI	10.62328/sp.v26i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v26i1.1
Pages	1-20
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah



Check for updates

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্যরীতি

মাহবুব সাদিক

নিরীশ্বর ও 'বৈরী বিশ্বে'র মুখোমুখি প্রাণযাত্রায়, নিরন্তর 'একাকী' এক বাঙালি কবি অস্তিত্বের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আধুনিক জীবনের শূন্যতা ও বৈকল্যকে অনুভব করেছেন। মানুষের জৈবনিক বিষবাহ্য তাঁর চেতনাতৈতন্যে ও অভিজ্ঞতায় বাড়া তুলেছিলো। শতাব্দীর বাড়ো উন্মাতাল মানব-মানস মূর্ত হয়েছে তাঁর উজ্জ্বল পংক্তিমালায়। এই বাঙালি কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।^১ স্বকাল-পরিসরে দু'টি মহাযুদ্ধবাহিত জীবনবৈকল্যের পটভূমিতে তিনি মর্মসুন্দ বেদনার অকপট প্রকাশে মহিমান্বিত। 'ত্রিশঙ্কু' ও নিরাবলম্ব এই কবিপুরুষ তাঁর নিজস্ব বিনীত ভঙ্গিতে জানান, তিনি অন্ধকারে বদ্ধমূল, কিন্তু আলোর দিকে উঠছেন।^২ 'বৈরী বিশ্ব' ও জড় প্রকৃতির মুখোমুখি সুধীন্দ্রনাথের জাগ্রত চেতন্য অবৈকল্যের উদাহরণ; তাঁর স্বরূপায়তন রচনাকর্মের সর্বত্র ছড়ানো তীক্ষ্ণ তীব্র চেতনা, মেধা ও প্রজ্ঞা। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর সাধনা ও সিদ্ধি মূলত তাঁরই অসামান্য মেধার ফসল। আবাল্য যুক্তির ভক্ত এবং প্রেরণা নামক পদার্থে অবিশ্বাসী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত গদ্য ও পদ্য রচনায় সমান মনোযোগী। কবি আর নৈরায়িকের পংক্তিভোজন স্বভাববিরুদ্ধ মনে করেন না তিনি। কিন্তু স্বভাবত 'হৃদ্যব্যসারী' চিলে-চালা বাঙালি লেখককুল যুক্তির ধার কমই ধারেন এবং এ জন্যেই বাংলা কবিতার সর্বত্র 'অসংলগ্ন' ভাবচছবির অনিকাম সংঘট্ট লক্ষ্য করে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা প্রবন্ধও তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন।^৩

অতিবিনয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কাব্যক্ষেত্রে নিজেকে 'পল্লবগাহীদের পদাঙ্কচারী' আখ্যা দিলেও, তাঁর সাফল্য একক ও অসামান্য। কাব্যরচনায় তাঁর কাছে 'আধার আধেয়ের অগ্রগণ্য।'^৪ কাব্যক্ষেত্রে ভাষা ও রচনারীতি সম্পর্কে তীব্রভাবে সচেতন সুধীন্দ্রনাথ এবং আঙ্গিকের উপর এই তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি তাঁর গদ্যরচনাতেও লক্ষ্যযোগ্য। বর্তমান রচনাপরিসরে আমরা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্যরচনার ভাষা বিষয়ে আলোচনা করবো। এ জন্যে তাঁর অতি-তীক্ষ্ণ মনস্বিতা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত বোধহয় অপূয়োজনীয় হবে না।

দূতবদ্ধ সংগঠনের পরিবর্তে, সমকালীন ও পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে সুধীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন আবেগ ও ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাবল্য, অসংগতি ও শিথিলতা। শুধু কবিতায় নয়, গদ্যরচনাতেও ছিলো যুক্তির পরিবর্তে আবেগ-উচ্ছ্বাসের বন্যা। আঙ্গিকশৈথিল্য ও ভাষাবিশেষে অমনোযোগ, বাঙালি লেখকের আলস্য-নেশায় বৃন্দ চরিত্রই উদ্ঘাটিত করে। একা রবীন্দ্রনাথ এবং ভাষাবিশেষে কতকাংশে বক্ষিমচন্দ্র ছাড়া রচনাকর্মে অন্য লেখককুল প্রায়ই বলগাহারা। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর রচনাকর্মের সর্বত্রই এক সচেতন প্রজ্ঞা ও চৈতন্যের পরিচয় দিয়েছেন। গদ্য রচনার বেলায়ও এই প্রজ্ঞা ও চৈতন্যের যুগপৎ সম্মিলন পাঠককে বিস্মিত করে। শাসিত আবেগ ও অনুরনিষ্ঠ এই সাহিত্য-প্রতিভার প্রস্তুতিবিষয়ে বুদ্ধদেব বস্তুর মন্তব্য স্মরণযোগ্য।

“...সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ও মনস্বী, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী বুদ্ধির অধিকারী, তথ্যে ও তত্ত্বে আসক্ত, দর্শনে ও সংলগ্ন শাস্ত্রসমূহে বিদ্বান; তাঁর পঠনের পরিধি

ছিলো বিরাট, ও বোধের ক্ষিপ্ততা ছিলো অসামান্য। সেই সঙ্গে যাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান, সাংসারিক ও সামাজিক স্বেচ্ছা, তাও পূর্ণমাত্রায় ছিলো তাঁর, কোনো কর্তব্যে অবহেলা করতেন না, গার্হস্থ্য ধর্মপালনে অনিন্দনীয় ছিলেন, ছিলেন আলাপদক্ষ, রসিক, প্রখর ব্যক্তিত্বশালী, আচরণের পুঙ্খানুপুঙ্খে সচেতন, এবং সর্ববিষয়ে উৎসুক ও মনোযোগী। এই বর্ণনা থেকে বুঝা যাবে যে, একটু চেষ্টা করলেই, বাংলা সাহিত্যের চাইতে আপাতবৃহত্তর কোনো ব্যাপারে নায়ক হ'তে পারতেন তিনি;...’’ ও

ভাবাবেগময় বাংলা সাহিত্যের পটভূমিতে সক্রিয়, বুদ্ধিনির্ভর এবং মননশীল প্রতিভাদীপ্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু অন্যত্র লিখেছেন :

“সুধীন্দ্রনাথের তনু-তনুয়তার সঙ্গে মিলেছে তাঁর আভিজাতিক স্মৃতি, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রলোক তাঁর দুর্লভ মননশীলতায় গম্ভীর।’’ ও

সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পাণ্ডিত্য ও মননশীলতা তাঁর কাব্যের মতোই গদ্যরচনাতেও অবিস্মরণীয়ভাবে উপস্থিত। বাংলা গদ্যের বিবর্তনের ধারায় বর্তমান লেখকের মনন ও মেধা, ব্যক্তিত্ব ও বিশ্লেষণীবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এক নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে।

ব্যক্তিস্বরূপের সঙ্গে রচনারীতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তি-স্বরূপ দুটি প্রবন্ধগ্রন্থের স্বরূপ-পরিসরেই এক অনন্য গদ্যভাষার জন্ম সম্ভব ক’রে তুলেছে। বাংলা গদ্যসাহিত্যের আঙ্গিক-শৈথিল্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর তীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি ও প্রখর মনস্বিতা প্রাপদী ভাব-ভাষার সাযুজ্যসম্মত গদ্যরচনা ক’রে ভাষাশৈথিল্যের দায়ভাগ থেকে বাংলা গদ্যকে রক্ষা করেছে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ব্যক্তিমানসের বিশিষ্ট প্রতিভা বাংলা গদ্যকে যে নতুনতর আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য দিয়েছে, তার আলোচনার পূর্বে বাংলা গদ্যের রীতিপ্রকৃতি বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। ভাষা যে পরিবর্তনশীল এবং নতুন লেখকপ্রতিভার হাতে তা নতুনতর রূপান্তর ও বৈচিত্র্য পায়, বাংলা গদ্যই তার উদাহরণ। বিভাষী ও বিজাতীয়েদের হাতে উনিশ শতকের প্রথম দশকে যে গদ্যভাষার প্রথম পদযাত্রা তা তৃতীয়-চতুর্থ দশকে দ্বৈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের [১৮২০-১৮৯১] রচনায় স্বাভাবিক প্রাঞ্জল ও শিল্পগুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরের গদ্যভাষাই পরবর্তী বাংলাগদ্যের বহুমুখী বিকাশের ভিত্তিভূমি।^১ সমকালীন জীবনচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে গদ্যে কথ্যবুলির ব্যবহার টেকচাঁদেদের [১৮১৪-১৮৮৩] ‘আলালের ঘরের দুলাল’কে [১৮৫৮] স্মরণীয় বৈচিত্র্যমণ্ডিত করেছে। মুনির চৌধুরী [১৯২৫-১৯৭১] বাংলা গদ্যরীতির একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু চমৎকার যথাযথ রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন এভাবে :

“টেকচাঁদ ও বিদ্যাসাগর উভয়ের রচনার দুই বিশিষ্ট প্রকৃতির শক্তির সমন্বয় সাধন করে বঙ্কিম প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর নিজস্ব গদ্যের এক হৃদয়গ্রাহী আদর্শ রূপকে। এই ভাষাকেই নিজের অনন্যসাধারণ ভাবকল্পনার উপযোগী বাহনরূপে পুনর্গঠিত করেন রবীন্দ্রনাথ; ভাষাকে করে তোলেন সূক্ষ্ম ও প্রগাঢ়, সঙ্কেতময় ও সঙ্গীতময়, বহুবর্ণশোভিত ও কারুকার্যমণ্ডিত। কিন্তু রাবীন্দ্রিক গদ্যরীতিও প্রথম চৌধুরীর পুরোপুরি মনঃপূত হয়নি। বিদগ্ধজনের কথ্যবুলির আদলে তিনি সৃষ্টি করলেন নতুন এক প্রখর ও শাণিত গদ্যের ধারা। পরিবর্তনের জোয়ার যে এখানে এসেই থেমে গেছে তা নয়। শরৎচন্দ্র কি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, মুজতবা আলী কি অনুদাশঙ্কর

রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ ব্যক্তিমানসের বিশিষ্ট প্রতিভা, প্রয়োজন ও প্রবণতা অনুযায়ী বাঙলা গদ্যরীতিকে যথার্থ বহুমাত্রিকতা দান করেছেন।”^৮

উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনাপরিসরেই আমরা বাংলা গদ্যরীতির একটি বিজ্ঞানসন্মত বিশ্লেষণ পাই। কয়েকটি স্বতন্ত্র ধারাও এখানে সূচিহিত। এই ধারায় রবীন্দ্রপরবর্তী সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও বিশিষ্ট ধ্রুপদী গদ্যধারার জন্ম দিয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর ঈষৎ পূর্ববর্তী দুটি গদ্যরীতির একটি রবীন্দ্রনাথের, অন্যটি প্রমথ চৌধুরীকৃত। গদ্যরীতি সম্পর্কে মুনীর চৌধুরীর বক্তব্যের মধ্যেই রবীন্দ্রিক গদ্যরীতি সম্পর্কে যথার্থ মন্তব্য রয়েছে। যাকে ‘কমপ্যাক্টনেস’ বলা যায় রবীন্দ্রনাথের গদ্যে তা নেই। তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিজাল তাঁর গদ্যভাষায় অনুপস্থিত। তথ্য ও তত্ত্বের সাহায্যে সিদ্ধান্তে আসেন না তিনি, ভাববাহিত সংকেতময় ও সুক্লব কারুকার্যমণ্ডিত ভাষায় পাঠকের মগ্নচৈতন্যকে ছুঁয়ে যান। এক অপরূপ ভাবালুতার আবিষ্ট হন পাঠক। ভাব ও অভিব্যক্তি বিস্তারে অধিতীয় তিনি। “রবীন্দ্রনাথের মন অনেক বেশী তথ্যবিমুখ, অনেক বেশী উৎসাহাশুচরী।”^৯ ফলত তাঁর প্রবন্ধ পাঠকের তত্ত্ব ও তথ্যের পিপাসা না মিটিয়ে আবেগকে উদ্বুদ্ধ করে। স্বভাবত ‘হৃদ্যব্যবসারী’ রবীন্দ্রনাথের ভাষা তাঁর সমগ্র ব্যক্তিস্বরূপের মুদ্রা। স্কুমার সেন লিখেছেন :

রবীন্দ্রনাথের ঠাইল তাঁহার চিন্তার ও চৈতন্যের স্রুগভীর উৎস হইতে উৎসারিত। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ পূর্ববর্তী গদ্য লেখকের কাছে বিষয় ছিল বাহ্যবস্ত; লেখক দূর কিংবা নিকট হইতে আগ্রহ অথবা অনাগ্রহের সহিত সে বস্তু ব্যবহার করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনার বিষয়ীভূত বস্তু সম্পূর্ণভাবে তাঁহার স্বকীয় ভাবনার ও চৈতন্যের সহিত ওতপ্রোত হইয়া যায়। তিনি যাহা বর্ণনা করেন তাহা যেন নিজেরই বৃহৎ চৈতন্য ও ব্যাপক অনুভূতির সীমাবদ্ধিত।^{১০}

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথের গদ্যের রীতিপ্রকৃতি বিষয়ে যে-সব মন্তব্য করেছেন তার সার-সংক্ষেপ এ রকম : প্রাথমিক যুগের রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার গতিবিধি মোটের উপর বঙ্কিমী ; এবং তৎসত্ত্বে তাতেই তিনি স্বীয় ব্যক্তিস্বরূপের ছাপ ফুটিয়েছেন বটে, কিন্তু অন্তত আরও বিশ বছর না কাটা পর্যন্ত তিনি [রবীন্দ্রনাথ] বুঝেন নি যে সাধু বাংলার বাক্যগঠন পদ্ধতি এমনই অকষ্টবদ্ধ ও গতানুগতিক যে তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাহন হিসাবে প্রায় অব্যবহার্য। “অথচ তাঁর সাবেকী ভাষা বঙ্কিমের মতো গুরু-চণ্ডালী দোষে দুষ্ট নয় ; তাতে সর্বনামের লিখিত ও কথিত রূপের শ্রুতিকটু সংমিশ্রণ বড় একটা নেই ; এবং তিনি যেহেতু গুরু থেকেই জানতেন যে প্রাকৃত বাংলায় কৃ-ধাতু ছাড়া আরও বহু ক্রিয়াপদ চলে, তাই সাধু হয়েও তাঁর গদ্য কখনও স্থবির নয়, সর্বদা বেগবান। ...এবং ধ্বনির খাতিরে অথবা অর্থগৌরবের তাগিদে তিনি যদিও বার বার সংস্কৃত শব্দকোষের শরণ নিয়েছেন, তবু তিনি কদাচিৎ ভোলেননি যে প্রাকৃত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ স্বতন্ত্র ও স্বগত।”^{১১}

প্রমথ চৌধুরী [১৮৬৮-১৯৪৬], ফরাসি রচনারীতি ঘাঁর প্রিয়, বাংলা গদ্যের কথ্য-রূপের প্রবর্তনে সার্থক ভূমিকা পালন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে সাধুভাষার চূড়ান্ত সমৃদ্ধির পরেও তিনি গদ্যে চলৎশক্তির অভাব অনুভব করেছেন। তাঁর রুচিশীল বিদগ্ধ মনন বাংলা গদ্যভাষায় কথ্যভঙ্গির প্রতিষ্ঠা করেছে। যদিও প্রকৃত কথ্যবুলি প্রাকৃত-জনের মুখেই থেকে গেছে, তবু সাধু গদ্যের তুলনায় ভাষা নতুনতর প্রাণশক্তিতে শাণিত হয়েছে সন্দেহ নেই। প্রমথ চৌধুরীর গদ্য সম্পর্কেও সুধীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মর্তব্য : লৌকিক ভাষার প্রবর্তন করলেও, “প্রয়োজনমত ইংরাজী শব্দের আহরণে প্রমথ নাথ অপেক্ষাকৃত

অকুণ্ঠিত। তাহলেও তাঁর প্রতিভা রুচিপ্ৰধান, তথা ঐতিহ্যপ্রভব। ...চৌধুরী মহাশয় শ্রমলাষবের লোভেই রুচিৎ-কদাচিৎ বিদেশী বাক্যের শরণ নেন বটে, তবু বাংলার বাচনিক পদ্ধতিতে যে-বিষয়ের আলোচনা অসম্ভব, তাঁর প্রতি সাধারণতঃ তিনি বিমুখ। ...তাঁর উক্তি সর্বদাই ক্ষুরধার, কিন্তু সর্বত্র সুসম্বন্ধ নয়; ...‘১২ প্রমথ চৌধুরীর গদ্যবিষয়ে সুধীন্দ্রনাথের মতামত অন্যত্রও প্রকাশিত হয়েছে এভাবে: ‘...সাইকেলের অনুস্বর-বিসর্গ-বিবজ্জিত সংস্কৃত একখানা যে-কোনও অভিধানের সাহায্যেই আপামর জনসাধারণের বোধগম্য; অথচ প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নিতান্ত চলতি বাংলা বহুভাষাবিদ পাঠকের অপেক্ষা তো রাখেন, এমন কি একাধিক বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না হলে, বীরবলী সাহিত্যের গুটী তাৎপর্য অনাস্বাদিত থেকে যায়।’ ১৩

প্রাথমিক বাংলা গদ্যের কৃত্রিমতা ও সংস্কৃতানুসারিতা সম্পর্কে জ্ঞানীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

‘Literary Bengali of Prose, during the greater part of the 19th century, was thus a doubly artificial language and with its forms belonging to middle Bengali and its vocabulary highly Sanskritised, it could only be compared to a ‘Modern English’ with a chaucerian grammar and a Super-Jonsonian vocabulary, if such a thing could be conceived.’ ১৪

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা গদ্যের সবগুলো ধারা সম্পর্কে শুধু অবহিত ছিলেন না, সেগুলোর ভেতরকার দৌর্বল্য ও শক্তি সঠিকভাবে বিশ্লেষণও করেছেন। গদ্যরচনার ক্ষেত্রে তিনি আকস্মিক ও শিথিলভাবে এগোন নি, প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি তাঁর ছিলো এবং প্রস্তুতি ও মেধাই তাঁকে সফলতার দরোজায় পৌঁছে দিয়েছে। বাংলার কৃতি গদ্যকারদের রচনার রূপবৈশিষ্ট্য ও আঙ্গিক বিশ্লেষণ করে তার সফলতা ও দুর্বলতা, কলাগম্বন্ধি ও ব্যর্থতাকে মূল্যায়ন করে নিয়েছেন তিনি। এবং এই সূত্রেই সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্যভঙ্গিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো আমরা।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধগ্রন্থ মাত্র দুটি। প্রথমটির নান ‘স্বগত’ [প্রমথ সংস্করণ ১৩৪৫, ভারতীভবন, ১১ কলেজ স্কোয়ার কলকাতা থেকে শ্রী কুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক প্রকাশিত। উৎসর্গ: ‘ধূজ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের করকমলে’; দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত) ১৩৬৪। প্রকাশক, শ্রীদীলিপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০/২ এলগিন রোড, কলকাতা-২০] এবং দ্বিতীয়টি ‘কুলায় ও কালপুরুষ’ [প্রথম সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৬৪। প্রকাশক, শ্রীদীলিপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০/২ এলগিন রোড, কলকাতা-২০]। ‘স্বগত’-এর প্রথম সংস্করণের প্রবন্ধের সংখ্যা ছিলো উনিশটি। দ্বিতীয় সংস্করণে ‘সূচনা’ ও ‘পুনশ্চ’ ছাড়া প্রবন্ধের সংখ্যা পনেরোটি। ‘কুলায় ও কালপুরুষ’-এ প্রবন্ধের সংখ্যা ‘মুখবন্ধ’ ছাড়া উনিশটি। দুটি গ্রন্থপরিগরে যেসব প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে সেগুলোর রচনাকাল ১৯৩০ থেকে ১৯৪৬-এর মধ্যে। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যবর্তী দশ বছরেই অধিকাংশ প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। ১৯৪০-পরবর্তী রচনা মাত্র তিনটি। এর দুটি ১৯৪১-এ এবং একটি ১৯৪৬-এ। তাঁর অন্যান্য গদ্যরচনার মধ্যে ‘সংবর্ত’ এবং ‘অর্কেস্ট্রা’ কাব্যের মুখবন্ধ ১৯৫৩, ‘প্রতিধ্বনি’-এর ভূমিকা ১৯৫৪, ‘স্বগত’-এর একটি প্রবন্ধ ‘পুনশ্চ’ ১৯৫৬ এবং ‘কুলায় ও কালপুরুষের’ ‘মুখবন্ধ’ ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে রচিত।

বাংলার শিথিল-গ্রন্থিত গদ্যসাহিত্যের পটভূমিতে সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্য ধ্রুপদী রচনারীতির এক অসামান্য কীর্তি। সংহত ও ঋজুস্বভাব তাঁর গদ্যভাষা সর্বত্রই প্রথাসম্মত ও নিয়মানুবর্তী। আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের দিকে মনোযোগী এই লেখক নিরন্তর চৈতন্যের

দরোজা খুলে রাখার পক্ষপাতী। পূর্ববর্তী গদ্যকারদের দক্ষতা ও দুর্বলতা নথ্যদর্পণে ছিলো বলেই তিনি গদ্য নির্মাণকলায় অতোটা মনোযোগী। তাছাড়া লেখকের ব্যক্তিস্বরূপের সঙ্গে সাহিত্যের আঙ্গিকবৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। এ জন্য সুধীন্দ্রনাথের গদ্যপদ্যের সর্বত্রই তাঁর ঋজুকঠিন তীক্ষ্ণ মেধাবী ব্যক্তিস্বরের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর অভিজাতস্বলভ মেজাজ ও মননশীল পাণ্ডিত্য গদ্যরচনার ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল। তাঁর ভাষার সংহত সংযত রূপরীতি এবং বক্তব্যের মননশীল যুক্তিনিষ্ঠা বাংলা গদ্যের শিথিল ও পতনপ্রবণ বিচ্যুতির ক্ষেত্রে প্রপদী গদ্যের জন্ম দিয়েছে।

কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের নিরেট সংহত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গদ্যভাষা সম্পর্কে সমকালীন পাঠক ও সমালোচকগণ সবসময় উচ্ছ্বসিত ছিলেন, এমন নয়। এ সম্পর্কে স্বয়ং সচেতন সুধীন্দ্রনাথকে সমালোচকদের মন্তব্য মারোমধ্যে ক্ষুব্ধও করেছে। তাঁর প্রবন্ধে ব্যবহৃত ভাষা সম্পর্কে সমকালীন সমালোচকদের অভিযোগের অন্যতম হচ্ছে : তাঁর বাক্যগঠনপদ্ধতি ও বাক্যরীতি বাংলা ভাষার বাক্যগঠনপদ্ধতি ও বাক্যরীতিকে অনুসরণ করে না। ইংরেজি ভাষার বাক্যরীতি ও বাক্যগঠনপদ্ধতিকেই তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন :

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ‘through out each sentence completly in English translating it, almost word for word, into a rich and fabulous Bengali.’

অন্যত্র তাঁর উক্তি : This prose, produced cerebrally, with almost a fastidiousness might effect, appear to be the work of highly gifted European who has taken the trouble of studying first sanskrit and then Bengali, and the additional trouble of speaking out his mind of European and Bengali literatures in the comparatively insufficienut language of the latter.’ ১৫

বুদ্ধদেব বসুর এই মন্তব্যের দুটো অংশ লক্ষ্যযোগ্য। প্রথমতঃ, তাঁর মতে, সুধীন্দ্রনাথ প্রতিটি বাক্য প্রথমে ইংরেজিতে চিন্তা করেছেন এবং পরে তাকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ বাংলায়, বলতে গেলে শাব্দিক অনুবাদ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, সুধীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা মস্তিষ্ক-প্রসূত, এবং এই ভাষা এমন এক পণ্ডিত ইউরোপীয়ানের স্থষ্টি যিনি প্রথমে সংস্কৃত শিখে পরে বাংলা শিখেছেন।

উভয় মন্তব্য প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে এ ব্যাপারে সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্য জেনে নেয়া প্রয়োজন। প্রবন্ধাবলীর বিভিন্ন অংশে এ সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন, তা নিয়ে উদ্ধৃত করছিলাম :

১. ‘হিতৈষীদের বিচারে সংস্কৃত আর ইংরাজী ভাষার বর্ণসঙ্কর ঘটিয়ে আমি যে-অস্পৃশ্য রচনারীতির জন্ম দিয়েছি, বঙ্গভারতীর নাটমন্দিরেও গে-হরিজনের প্রবেশ নিষিদ্ধ ;...’ ১৬
২. ‘...এক অনুকম্পারীর বিচারে আমার স্থানাক্ষবর্জিত পদ্যরচনা, অদ্ভুত মুদ্রাদোষ সত্ত্বেও, নিঃসংশয়ে ভরতবংশীয় বটে, কিন্তু আমার সংস্কৃত-সম্বল গদ্যের গোড়ী পদপাত বাংলার মাটি ভুলেও মাড়ায় না। উক্ত সুক্ষদর্শীর রুচিতে ও বিবেচনায় আমার শ্রদ্ধা যদিও অসীম, তবু তাঁর অভিমতে আমি সায় দিতে পারিনি ;...’ ১৭

৩. 'তবে আমার উৎকট গতি জানত কোনও বিদেশীর পদানুসরণ থেকে উৎপন্ন নয় ; এবং শত চেষ্টায় বর্তমান লেখাগুলোর একটাকেও আমি ইংরাজী অনুবাদের ছকে ফেলতে পারিনি, যদিচ আমার কয়েকটা কবিতা অনুরূপ রূপান্তর অলপাধিক মেনেছে। স্মরণ্য আগার চিন্তাপ্রণালী অন্তত তাঁদের কাছে বঙ্গীয় লাগবে, যাঁদের অভিজ্ঞতায় ভাব ও ভাষা যমজ ;' ... ১৮

উপরের আলোচনায় সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসুর অভিযোগ স্পষ্টতঃ অস্বীকার করেছেন। তাঁর গদ্যভাষার বাক্যসংগঠনপদ্ধতি সর্বত্র ইংরেজি ভাষার অনুরূপ, এ-সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ যথার্থ বলে মনে হয় না। বিশেষত সুধীন্দ্রনাথ বাক্যকাঠামোকে ইংরেজিতে ভেবে তার বাংলা অনুবাদ করেছেন এ অভিযোগ যথার্থ নয়। ক্লাসিক ইংরেজি গদ্যে একাভিমুখী কয়েকটি বক্তব্য কমা ও সেমিকোলনের সাহায্যে একই বাক্যে ঠেসে দিয়ে বাক্যের গঠনকে সুসংগঠিত ও সংহত করবার রীতি স্মরণে রেখেই বোধকরি বুদ্ধদেব বসু উপর্যুক্ত মন্তব্য করেছেন। সত্য যে সুধীন্দ্রনাথের গদ্যেও অনুরূপ আঙ্গিক ব্যবহৃত, তবু বাংলা বাক্যবিন্যাস-কাঠামো তিনি অস্বীকার করেননি, পদক্রমকে গাজিয়েছেন যথার্থ ব্যাকরণ-গত রীতিপদ্ধতির মাধ্যমে। বাংলা বাক্যে শব্দের অপপ্রয়োগ, ব্যাকরণ বিভ্রাট এবং অপটু বাক্যবন্ধের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে একটি বিশিষ্ট গদ্যশৈলীর জন্ম দেয়া সম্ভব হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক পর্যন্ত সোয়া শ' বছর বয়সী বাংলা গদ্যে যে শৈথিল্য ও তরলতা ছিলো, তিনি সেই শৈথিল্যকে নিরেট বাক্যবন্ধে রূপান্তরিত করেছেন। বাঙালি পাঠকের যোধ্য-মনন সম্পর্কে পূর্বতন গদ্যকারদের তীব্র ত্যাগ ও অবিশ্বাসে ক্ষুদ্র সুধীন্দ্রনাথ অতিতরল অতিসরল গদ্যকে সংযম ও সংহতি দিয়েছেন নিজস্ব বিশিষ্ট প্রকাশশৈলীর মাধ্যমে। পূর্বসূরীদের ভাষা-ব্যবহারে ভাবানুভূতি ও শৈথিল্য, নড়বড়ে বাক্যবন্ধ, পদক্রমের যথেষ্ট ব্যবহারে উত্থিত সুধীন্দ্রনাথ ধ্রুপদী শিল্পীর নির্ভর্য নিজেই নিয়োজিত করেছেন। ধ্রুপদী রীতির এই সংহতি ও কখনো কখনো অতি-সংহতির কারণেই বাঙালি সমালোচক তাঁর বাক্যে ইংরেজি বাক্যগঠনপদ্ধতির রূপরেখা খুঁজে পেয়েছেন।

এ সত্য বাঙালি সমালোচকরা ভুলেছেন যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও অসামান্যতা বাঙালি লেখককুল মূলত ইউরোপীয় সাহিত্যভাণ্ডার ঘেঁটেই পেয়েছেন। নিছক কলাকৌশলে সংস্কৃত রচনাকারদের উৎসাহ ছিলো বটে, কিন্তু আধুনিককালে রামমোহন রায় [১৭৭৪-১৮৩৩] থেকে শুরু করে হালের লেখক পর্যন্ত সবাই পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবনা ও আঙ্গিকের দ্বারস্থ হয়েছেন। মধুসূদনের রচনায় বক্তব্যগত দিকটাই শুধু ইউরোপীয় ভাবনাভঙ্গিকে অনুসরণ করেনি, আঙ্গিকেও পাশ্চাত্যরীতিকে স্বীকরণ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যেরকম ইংরেজি সাহিত্যের, প্রমথ চৌধুরীর ক্ষেত্রে তেমনি ফরাসি মনোভঙ্গি ও আঙ্গিকের প্রতিপোষণ লক্ষ্যযোগ্য। তাছাড়া আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে একক ও মৌলিক রীতিপদ্ধতি আর অবিকৃত নেই। এক-ভাষার শ্রেষ্ঠ রূপাঙ্গিক স্বাভাবিকভাবেই অন্যভাষাকে প্রভাবিত করতে পারে। অন্য লেখকদের কথা ছেড়ে দিলেও রবীন্দ্রনাথের গদ্যে কোথাও কোথাও ইংরেজি বাক্য বা বাক্যাংশের যে গাঢ়ত্ব বর্তমান তার আলোচনা করলেই আমরা বুঝবো যে এই নির্দেশ-প্রভাব বাংলাভাষার প্রকাশক্ষমতা কতোটা বাড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনায় ইংরেজি গদ্যের প্রভাব সম্পর্কে সুকুমার সেন বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

এই আলোচনার কিছু উদ্ধৃত করা যাক : ১৯

“ক. গুণবাচক বা ভাববাচক বিশেষ্যপদের পূর্বে ইংরেজী indefinite article-এর মতো অনির্দেশক ‘একটি’ ‘একটা’ শব্দের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের গদ্যের অন্যতম প্রধান

বিশেষত্ব, বিশেষ করিয়া প্রথম বয়সের রচনায়। যুরোপ-প্রবাসীর পত্রে এই প্রয়োগ অত্যধিক এবং তাহা ইংরেজিয়ানার কাছ ঘেষিয়া গিয়াছে। যেমন,

‘যাদের মা, বাপ, বোনকে, একটা কসাই, একটা দরজী ও একজন কয়লা-বিক্রেতা ছাড়া আর কেউ চেনে না ...’

খ. বিশেষণপদকে বিশেষ্যরূপে প্রয়োগের মূলও বোধ করি ইংরেজীর অনুসরণ আছে। যেমন,

‘যেখানে কোনো ডাকের সাড়া, কোন প্রশ্নের কোন জবাব নাই, এমন একটা সীমানা-হারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল। [চতুরঙ্গ] ...’

গ. “রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতিতে আরও যে ইংরেজী ছাঁদের ছায়া পড়িয়াছে তাহার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

তাহার নিজ গৃহের দারিদ্র্যের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে (=to return to the poverty of his own home) কিছুতেই তাহার অভিরুচি হইল না। [প্রায়শ্চিত্ত] ...

রমেশ অনুদাবাবুর বাড়ী চা খাইতে এবং চা না খাইতেও (=to take and not to rake tea) প্রায়ই যাইত। [নৌকাডুবি]

...এ যে একেবারে উপন্যাসের মত—সেও কুলিখিত উপন্যাস। (=even that a badly written novel!) [মাল্যদান]

...অজস্র গল্প হাসি-ঠাট্টায় তাহার চারিদিকের হাওয়া যেন বিদ্যুৎশক্তিতে বোঝাই হইয়া থাকিত। (=atmosphere was charged with electricity) [হালদার গোষ্ঠী] ...

...সেই ভালবাসার চারিদিকে তারি একটি স্বাস্থ্যকর হাওয়া (=a very healthy atmosphere) বহিত। [হৈমন্তী] ...

রবীন্দ্রনাথের গদ্যে যেখানে ইংরেজি ভাষার বাক্যগঠনপদ্ধতি বা বাক্যাংশের সাদৃশ্য রয়েছে সেখানে অন্যদের রচনায়ও তা থাকতে পারে। তাছাড়া ইংরেজি ভাষার প্রকাশ-রীতির এই স্বীকরণ বাংলা ভাষার প্রকাশক্ষমতা যে অনেকখানি বাড়িয়েছে, তা বোধকরি না বললেও চলে। বুদ্ধদেব বসুর [১৯০৮-১৯৭৪] গদ্যভঙ্গিও আধুনিক ইংরেজি গদ্যের প্রকাশরীতির স্পর্শ পেয়েছে। কয়েকটি বাক্যের উদাহরণ :

১. ‘প্রথমেই জেনে নিতে হবে যে ছন্দ জিনিষটা কৃত্রিম নয়, মিল অনুপ্রাসাদি আনুসঙ্গিক অলংকার নিয়ে শুধুমাত্র একটা কৌশলও নয়, কাব্যের প্রাণের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সংযোগ।’ [বাংলা ছন্দ : সাহিত্য-চর্চা]

২. ‘বাংলা সাহিত্যের এটাই বোধ হয় শোচনীয় দুর্ঘটনা যে গধুসুদন দত্ত কোন ঐতিহ্যকে আঙ্গসাৎ করতে পারলেন না, না স্বজাতীয়, না বিজাতীয়’, ... [মাইকেল, সাহিত্যচর্চা]

৩. 'সত্যি বলতে, রাবণের মহত্ত্বের সম্ভাবনা মাইকেল অঙ্কভাবে উপেক্ষা ক'রে গেছেন, আবার প্রতিপক্ষের দুর্বলতাও কিছুমাত্র প্রকাশ করতে পারেন নি।' [মাইকেল, সাহিত্যচর্চা]

৪. কিন্তু এই মত একটা জায়গায় টেকে না। [মাইকেল, সাহিত্যচর্চা]

সমকালীন বাংলা সাহিত্যে যেখানে ইউরোপীয় মনোভঙ্গির প্রাধান্য সেখানে বুদ্ধদেব বসুর অভিযোগের দায়ভাগ একা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাঁধে চাপানো অবিচারের নামান্তর। সুধীন্দ্রনাথের সমসাময়িককালের প্রুপদী ইংরেজ গদ্যশিল্পী টি. এস. এলিয়টের সংযত ও সংহত রূপরীতি তাঁকে আকৃষ্ট ক'রে থাকবে। এলিয়টের গদ্যভাষার মতোই তাঁরও গদ্যরচনা ঠাঁসা এবং এলিয়ট এবং সুধীন্দ্রনাথের গদ্যের দুটি উদ্ভূতি এই সংহত রূপরীতির পরিচয় স্পষ্ট করবে :

এলিয়ট : What I mean by tradition involves all those habitual actions, habits, and customs, from the most significant religious rite to our conventional way of greeting a stranger, which represent the blood kinship of 'the same people living in the same place.' It involves a good deal which can be called taboo : that this word is used in our time in an exclusively derogatory sense in to me a curiosity of some significance.'^{২০}

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : 'কবিদের কাণ্ড জনসাধারণ যতই হাসুক না কেন, তবু তাদের সম্বন্ধে কিংবদন্তীর অন্ত নেই ; এবং এই রূপকথাগুলোর মধ্যে যেটা সবচেয়ে দুর্মর ও রহস্যময়, সে হচ্ছে প্রেরণা-নামক এক অলৌকিক শক্তি। যাঁরা কবিতা লেখেন না, শুধু পড়েন, যাঁরা লেখা-পড়া কিছুই ধার ধারেন না, তাঁরা যদি ভাবেন যে কাব্যরচনার জন্যে বিদ্যাবুদ্ধি, শিক্ষা-দীক্ষা, সাধনা-সংযম, এসমস্তই অনাবশ্যক, প্রয়োজন শুধু অর্থও অবসর আর অপার দৈবানুগ্রহ, তবে প্রতিবাদ ক'রে লাভ নেই ; কেননা কার্য-কারণ-বিধির প্রাত্যহিক ব্যতিক্রমই নৈমিত্তিক জীবনের প্রধান লক্ষণ। কিন্তু যখন কাব্য-রচয়িতা বা কাব্যবিবেচকদের মধ্যেও অনেকে এই উপকথার প্রশ্রয় দেন, তখন কাব্য-জিজ্ঞাসুর পক্ষে বিস্ময়বোধই একমাত্র মনোভাব ; এবং এ কথা চিন্তাশীল ব্যক্তি নাহেই জানেন যে শিল্পী ও কারুকর্মী—আর্টিস্ট ও আর্টিজ্যান—এদের উদ্যোগে কোনও মূলগত প্রভেদ নেই, পার্থক্য শুধু এদের মানসিক সংগঠনে। অর্থাৎ কারুকর্ম একটা চিরাচরিত প্রথার নিশ্চিত অনুকরণ : তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই, তার গোড়ায় নেই এষণার একাগ্রতা ; কিন্তু শিল্পসৃষ্টি উদ্ভূত চৈতন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত : তার প্রত্যেক অঙ্গ সজীব ও অপরিহার্য, প্রত্যেক অলঙ্কার বহু পরীক্ষার ফল।' ^{২১}

এলিয়টের গদ্যের মতোই ভাব ও বক্তব্য প্রকাশের দিক থেকে সুধীন্দ্রনাথের গদ্য নিরেট, বাহুল্যবর্জিত। শব্দের সংযত ও বিশেষ ব্যবহার প্রায় সর্বত্র তাঁর ভাষাকে ব্যঞ্জনা দিয়েছে। এই বাহুল্যবর্জনই তাঁর ভাষাকে সংহতি দিয়েছে। একজন সমালোচক অবশ্য বলেন যে তাঁর প্রবন্ধে প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি এলিয়টের প্রুপদী আদর্শকেই বাঙালি পাঠকের জন্য পরিবেশন করেছেন। ^{২২} সুধীন্দ্রনাথ এলিয়টের প্রুপদী আদর্শকে গ্রহণ ক'রে থাকতে পারেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বাংলা বাক্যকে তিনি ইংরেজি বাক্যের গঠনরীতি অনুযায়ী চিন্তা করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এই বিশিষ্ট প্রুপদী রীতির গদ্য বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে। কলাকৌশল সমৃদ্ধ এই সংহত প্রুপদী প্রকাশশৈলী বাঙালি পাঠকের পক্ষে যেমন নতুন, লেখকদের পক্ষেও তেমনি।

‘গদ্যের অবলম্বন বিজ্ঞান’ সুধীন্দ্রনাথ রচিত এই বাক্যাংশ যেমন বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি-বাদী গদ্যের দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে ভাষা ব্যবহার বিষয়েও তেমনি তিনি নিরেট নির্মাণ কর্ণে বিশ্ণাসী। গদ্যরচনায় তাঁর মতো যুক্তিনিষ্ঠ সূমিত বাক্যবিন্যাস ও শব্দপ্রয়োগ বাঙালি প্রবন্ধকারের রচনায় অনুপস্থিত। জটিল মনোভাবনা ও দার্শনিক প্রত্যয় প্রকাশের ক্ষেত্রে যে ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর চাইতে সুপ্রযুক্ত ভাষার কথা আর ভাবাই যায় না। বাক্যের সঙ্গে বাক্যের পারস্পর্য যুক্তির গভীরতর সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ। বাংলা গদ্যে এ ধরনের প্রপদী রীতি বলতে গেলে এটাই প্রথম। ফলে সুধীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ইংরেজি ধরনের বাক্য লেখার অভিযোগ আসলে অবাস্তব। তাছাড়া তিনি নিজেও জানতেন যে ইংরেজি ফরাসি বা জর্মন ভাষার সঙ্গে বঙ্গবাসীর আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ২৩

শব্দব্যবহারের বিশিষ্টতাই সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্যের ভিত্তিভূমি। শব্দব্যবহারের ক্ষেত্রে ফরাসি কবি মালার্মের বিশিষ্টতার প্রতি আকৃষ্ট সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘মালার্মের কাব্যাদর্শই আমার অন্তিষ্ট।’ মালার্মের ‘সংহত স্বল্পভাষ্য ব্যঞ্জনাময় প্রকাশশৈলী’র ২৪ কারণেই তিনি এই ফরাসি প্রতীকী কবির কাব্যাদর্শের সঙ্গে নিজস্ব মনোভঙ্গির যোগ খুঁজে পেয়েছেন। কবিতার মতো তাঁর গদ্যের রূপচরিত্রেও সংহত স্বল্পভাষ্য ব্যঞ্জনাময় প্রকাশশৈলীর সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। মালার্মের মতোই শব্দের অভিধানগত অর্থের বিনষ্ট সাধন ক’রে তিনি তাকে ব্যঞ্জিত অর্থে প্রকাশ করেছেন। ফলে শব্দ তাঁর দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। সুধীন্দ্রনাথের বাক্যগঠনপদ্ধতির সবচেয়ে লক্ষ্যগোচর বিষয় হচ্ছে বাক্যের সাংগঠনিক দৃঢ়তা।

গদ্যে শব্দের অর্থের দিকটাই প্রাধান্য পায়। শব্দ এখানে চিন্তার আধার মাত্র। লেখকের ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা এবং গভীরতা অনুযায়ীই মুখ্যতঃ শব্দ ব্যবহৃত হয়। এদিক থেকে সুধীন্দ্রনাথের শব্দপ্রয়োগ এমন যে শব্দের কোন ধরনের অর্থের দ্যোতনা বাদ পড়েনি। তিনি শব্দের স্বভাব সম্পর্কে লিখেছেন:

শব্দের স্বভাব টাকার মতো ; বহু ব্যবহারে তা ক্ষয়ে যায়, হস্তান্তরে তাতে কলঙ্ক জন্মে, বয়স তাকে অচল করে, আবার কালে সে স্থান পায় যাদুঘরের গ্লাসকেসে। কিন্তু মুজিয়ম-ভুক্তি বিনুপ্তির নামান্তর নয় ; অপ্ৰচলিত শব্দও অবস্থাবিশেষে কাজে লাগে। প্রাচীন মূদ্রার ব্যবহারিক মূল্য যখন ক’মে আসে, তখন তার আলঙ্কারিক মর্যাদা বাড়ে। ২৫

সুধীন্দ্রনাথের গদ্যের স্থাপত্যধর্মিতা এই শব্দব্যবহারের বিশিষ্টতার উপরেই দাঁড়িয়ে। নতুন-পুরোনো, প্রচলিত-অপ্রচলিত সমস্ত ধরনের শব্দই তিনি ব্যবহার করেছেন অবলীলায়। অপ্ৰচলিত মুজিয়মভুক্ত শব্দব্যবহারের ফলে বাংলা ভাষার প্রকাশক্ষমতা বেড়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে শব্দভাণ্ডার। কবিতায় অনিবার্য শব্দ যেরকম বিশিষ্ট ভাবানুশঙ্গের জন্যে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, সুধীন্দ্রনাথের গদ্যের ক্ষেত্রেও সংস্কৃতজাত ও অপ্ৰচলিত শব্দের বিশিষ্ট ব্যবহার তেমনি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। শব্দব্যবহারে কোনরকম সংস্কার কাজ করেনি তাঁর মধ্যে। সংস্কৃত শব্দের অতিব্যবহার সুধীন্দ্রনাথের গদ্যকে ভারাক্রান্ত করেছে ব’লে পাঠক মহলের ধারণা। এ ধারণার পেছনে পাঠকের আলস্যজনিত পাঠবিমুখতাই দায়ী। তাঁর লেখায় সংস্কৃত শব্দ ও অপ্ৰচলিত শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত। সংস্কৃত ও প্রাকৃত বা বাংলা কথ্য শব্দের সূমিত বিতরণ ব্যবস্থাই সুধীন্দ্রনাথের ভাষাকে করেছে দৃঢ়বদ্ধ। ‘কুলায় ও কালপুরুষ’ গ্রন্থের ‘শিল্প ও স্বাধীনতা’ প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠার (পৃ. ১২১) একশটি পংক্তি বিশ্লেষণ ক’রে আমরা তাঁর গদ্যে সংস্কৃত ও বাংলা শব্দের

ব্যবহার সম্পর্কে একটা ধারণায় পৌঁছবার চেষ্টা করবো। সফীত অক্ষরে নিম্না-উদ্ধৃত শব্দগুলো সংস্কৃত বা সংস্কৃতজাত, অন্যগুলো বাংলা :

স্বকীয় বিদ্যা-বুদ্ধির সহস্রক্রেত্রে অহেতুক গৌরববোধ সকল মানুষের স্বভাবগত ; এবং আমার আবাল্য অকর্মণ্যতা সত্ত্বেও গুরুজনেরা আমাকে যদিচ চিরকাল ধরে কোনও এক পরোপকারী পশুর সমপর্যায়ে ফেলে আসছেন, তবু অন্তত আকারে-প্রকারে সেই স্বনামধন্য জীবের বিজাতীয় হওয়ায় আমিও নিজের মেধা আর ব্যুৎপত্তির উপরে মানবোচিত আস্থা রাখি। কিন্তু বিজ্ঞান নৈব্যক্তিক : তার কাছে আত্মপ্রসাদও প্রশ্রয় পায় না ; এবং গণিতব্যবসায়ী বন্ধু-বান্ধবের মুখে যখন শুনি যে বস্তুবিশ্বের আদিম ও ক্ষুদ্রতম অধিবাসী পরমাণুর বিস্তার একেবারে অনন্ত, তখন আর এ-কথা না মেনে উপায় থাকে না যে আমার মতো নির্বোধের পক্ষে পরাবিদ্যা আর পদার্থ-বিদ্যা, দুইই যেহেতু অনশ্চিন্তার চর্চা, তাই নেতিবাদের স্থানে অনিশ্চয়-বোধকে বসিয়ে আমি খীশক্তির পরিচয় দিচ্ছি না, আমার নর্মান্তিক অবিদ্যাই ফুটিয়ে তুলছি। অবশ্য আধুনিক অন্ধশাস্ত্র অনেকেরই প্রবেশ ব্যাহত ; এবং আমাদের আত্মশ্রীয়া সচরাচর এত দুর্মর যে পারিভাষিকের ধাক্কায় তা শুধু মচকায়, ভাঙে না। তাহলেও সম্প্রতি সেই সহজ স্থিতিস্থাপকতাও আমি হারিয়েছি ; এবং আপেক্ষিক বা বৈশেষিক তত্ত্ব দূরের কথা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাধারণ্যেও আমার দৃষ্টি প্রতিহত।

উদাহরণত পাশ্চাত্য জগতের সমরসজ্জা উল্লেখযোগ্য : এবং গত বিশ বছর যাবৎ সে-অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতা যে কালে আগামী প্রলয়ের নিরন্তর বিভীষিকা দেখছে, তখন সেই অমোঘ সর্বনাশের অভ্যর্থনায় তাদের প্রাণপাত প্রযত্ন আমার বিচারে নিছক পাগলামি। কিন্তু অর্ধেক পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ কাণ্ডজ্ঞানবজিত এমন ধারণাও অনায়াস ; ...

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির সংস্কৃত শব্দগুলো লক্ষ্য করলে আমরা দেখবো যে আমাদের লেখককূল প্রতিনিয়ত এসব শব্দ ব্যবহার করেন। অপরিচিত শব্দ এখানে নেই বললেই চলে। বাংলার শব্দভাণ্ডারের ঐশ্বর্য যে সংস্কৃত থেকে এসেছে এ সত্য আমরা সহজে ভুলে যাই বলেই সুধীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সংস্কৃত শব্দের অতিব্যবহার বিষয়ে অভিযোগ ওঠে। বাংলা থেকে সংস্কৃত শব্দাবলীকে বর্জন করার কথা উঠলে ঠক বাছতে গা উজাড় হবার দশা হবে। স্বকীয়, বিদ্যাবুদ্ধি, স্বভাবগত, আবাল্য, অকর্মণ্যতা, পরোপকারী, পশু, স্বনাম-ধন্য, বিজাতীয়, মেধা, আত্মপ্রসাদ, আদিম, জীব ইত্যাদি শব্দ, যা উপরের প্রবন্ধের খণ্ডিত অংশটিতে সুধীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন, যদি সংস্কৃত হবার দোষে বর্জন করতে হয় তাহলে ভাষার শক্তি-সামর্থ্য অর্থাৎ প্রকাশক্ষমতা তো কমবেই, মনোভাবের বাহন হিসাবে বাংলা ভাষার কার্যকারিতা নেমে যাবে একেবারে নিম্নতম পর্যায়ে। ফলে সংস্কৃত শব্দের অতিব্যবহার বিষয়ে সুধীন্দ্রনাথকে আমরা দায়ী করতে পারি না। বরং অপরিচিত তৎসম শব্দব্যবহার করে ভাষার শব্দভাণ্ডারের ঐশ্বর্য বাড়িয়েছেন তিনি। তাছাড়া 'স্বল্প ভাষ প্রকাশশৈলী'র কারণেও এ ধরনের শব্দব্যবহার ছিলো অপরিহার্য।

বাংলা গদ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে সাংগঠনিক দৃঢ়তা ও স্থাপত্যধর্মিতা যোগ করেছেন তার পেছনে কাজ করেছে তাঁর সৃষ্টিধর্মী কবিসত্তা। এই প্রতিভাপুরুষের সৃষ্টিশীলতা কার্যকরী হয়ে উঠেছে নতুন শব্দ সৃষ্টিতে, অভিনব শব্দবন্ধ তৈরী এবং সংস্কৃত ও অপ্র-চলিত শব্দের সুপ্রযুক্ত ব্যবহার ক্ষেত্রে। অসংস্কৃত বাংলা ভাষার দৈন্য সম্পর্কে সচেতন সুধীন্দ্রনাথ সংস্কৃত, অসংস্কৃত, দেশী-বিদেশী, সাধু-চলতি কথা বা গ্রাম্য সব ধরনের শব্দই ব্যবহার করেছেন অবলীলায়। অনভ্যন্তর কানে সংস্কৃত শব্দের সংস্থানকৌশল কখনো কখনো বেহুসুরে ঠেকলেও তার উদাহরণ খুব বেশী নেই।

সুধীন্দ্রনাথের বাক্যকাঠামোয় তৎসম সাধু বা আভিধানিক শব্দের পাশে সরল কথ্য শব্দের ব্যবহার ভাষাকে সচল ও গতিশীল করেছে। কথ্যভাষার ইডিয়ম, কথ্য শব্দ, কখনো কখনো সচল ও অচলিত গ্রাম্য শব্দ অবলীলায় এবং শ্রবণসুভগভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ জন্যেই তাঁর রচনা স্থবিরতার অভিশাপ জয় করে উঠেছে। কথ্য এবং গ্রাম্য শব্দ সংস্কৃত বা অপ্রচলিত শব্দের পাশে যে অপরিহার্য বিন্যাস পেয়েছে, তার কিছু উদাহরণ :

১. তাতে যদি প্রথাগত স্থাপত্য বর্জনীয় ঠেকে, তবে তাই স্বীকার, তাতে যদি নাস্তিক বস্তুবাদী ইত্যাদি অন্যায় অপবাদ ঘাড়ে পড়ে, তবে তাও বরণীয়।

২. তখন আমার পক্ষে সাধারণ্যের সাধুবাদ ভূতের সুখে রামনামের মতো।
[স্বগত, পৃ. ১৯৭]

৩. তবে সোনার খনিও অবশেষে গজভুক্ত কপিথের দশা পায়। [স্বগত, পৃ. ২৩]

৪. তার প্রতিশ্রুত নন্দনের পথ বারংবার মরুর প্রান্তরে দিশা হারিয়েছে।
[স্বগত, পৃ. ৩৬]

৫. এবং তখন থেকে কাব্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার বদ অভ্যাস চুকল।
[স্বগত, পৃ. ৪৩]

৬. সে পণ করলে এই প্রবঞ্চনার দাদ্ তুলবে। [স্বগত, পৃ. ৭৭]

৭. তার পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে ভাব্যতা কোন ছার, সভ্যতার সম্পর্ক স্নদ্ধ এত শিথিল যে তাদের কার্যকলাপের সোজা বর্ণনা একেবারে অচল। [স্বগত, পৃ. ৮৩]

৮. এবং তাতে যে কৃতকার্য, সে উপভোক্তা তথাকথিত জটিলতাকেও আর ভরায় না।
[কু. কা. পৃ. ৯৭]

৯. সাধারণত কানা-খোঁড়াই যেহেতু এক গুণ বাড়ী, তাই কবিস্বল্পভ সংবেদন-শীলতা অনেক সময় নাকি অঙ্গহানির ফল। [কু. কা. পৃ. ১২৬]

উপরের বাক্য বা বাক্যাংশগুলোতে সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের পাশে কথ্য বা গ্রামীণ শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত চমৎকারভাবে খাপ খেয়েছে। ‘গজভুক্ত কপিথের’ পাশে ‘দশা পায়’, ‘মরুর প্রান্তরে’র পাশে ‘দিশা হারিয়েছে’, ‘প্রবঞ্চনা’র পাশে ‘দাদ্’, ‘বর্জনীয়ের’ পাশে ‘ঠেকে’ বা ‘ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার’ পাশে ‘বদ অভ্যাস চুকল’ প্রভৃতি কথ্য বা গ্রামীণ শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত। সুধীন্দ্রনাথের গদ্যে এ জাতীয় সাধারণ কথ্য ও গ্রামীণ শব্দের ব্যবহার একেবারে কম নয়। এ ধরনের শব্দ ব্যবহার ভাষার সচলতা বাড়িয়েছে এবং একটি তির্যক প্রকাশশৈলীর জন্ম সত্ত্ব করে তুলেছে। ফলতঃ কথ্য ও চলতি বাংলা শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের যথাযথ সংমিশ্রণেই সুধীন্দ্রনাথের গদ্যভাষার শরীর নিমিত। কথ্য চণ্ড তাঁর প্রবন্ধের কথকতায় স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে। কথ্য ও গ্রামীণ শব্দের আরো কিছু উদাহরণ :

সিকির সিকি ; রুচির মর্জি ; কবিতে কবিতে ; জপে ; লক্ষ-ঝাক্ষ ; গাল-ভরা ;
বালাই ; মজানো ; ঠেকুক ; মজে ; কলে ; ছাল ; সরে ; তাজ্জব ব্যাপার ; বাটনা

বাটা ; অক্ষিসন্ধি ; মন মজায় ; পস্তাচ্ছেন ; চকচকে তকতকে ; চেলা-চামুণ্ডার ; বলা শক্ত ; পৈতৃক ভিটা ; ঝুটা-জহরতের ; সবুরে মেওয়া ফলে ; বিশ্বাস ঠেকল ; আমরা পুছি না ; আশ-পাগলা ; ঠেকে ; ভুল-চুক ; আশ-পাশে ; আগা-গোড়া ; কায়-ক্লেশে ; ঝেড়ে ; টিকবে না ; কুলায় না ; নাগাল ; ধুম ; ভজানো ; খাটায় ; হের--ফের ইত্যাদি ।

সংস্কৃত এবং অপ্রচলিত শব্দের বহুল ব্যবহার থাকলেও সুধীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা কথ্য চওকেই অঙ্গীকার করেছে। উপরের উদাহরণগুলো ছাড়াও তাঁর প্রবন্ধ পরিসরে আরো বহু কথ্য শব্দ ছড়িয়ে রয়েছে। সাধু ভাষার কৃত্রিম শুদ্ধি বিষয়ে তিনি বরাবর অনীহ ছিলেন বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সংহত ধ্রুপদী গদ্য কথ্যভাষার তারল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য কখনো পায়নি। প্রেরণায় অবিশ্বাসী এই কবিপুরুষ ভাষাব্যবহারে সচেতন নির্মাণকর্মী ছিলেন।

এই সচেতনতা তাঁর ভাষার গঠনকৌশলকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। পুরনো ও অপ্রচলিত শব্দের প্রচলন যেমন ভাষার সমৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয়, নতুন শব্দবন্ধ তৈরীও তেমনি প্রতিভাদীপ্ত ভাষাশিল্পীর কাজ। শুধু কবিতাক্ষেত্রে নয়, গদ্যেও সুধীন্দ্রনাথ অনেক নতুন শব্দবন্ধ তৈরী করেছেন। ‘সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ’র ভূমিকায় বুদ্ধদেব বসু যেগুলো উল্লেখ করেছেন তার বাইরেও বেশ কিছু চমৎকার শব্দবন্ধ ও নতুন শব্দ তাঁরই হাতে নতুন আয়তন পেয়েছে। উদাহরণ :

দ্বিরানন ; দূর্যট ; স্বোপলব্ধ ; গন্তব্যাগত ; অন্তম ; আর্ষ ; অভিধা ; ধ্রুপদী ; বিদ্যা-দ্বিলাস ; প্রমা ; অমিষ্ট ; অনেকান্ত ; নিষ্কর্ষ ; প্রতিভাস ; অবৈকল্য ; নিরুপাখ্য ; অনুকম্পায়ী ; আমন্ত্র ; আত্মনিহিত ; ঐতিহ্য ; বহিরাশ্রয় ; নাতিনিম্ন ; ব্যক্তিস্বরূপ ; স্বাবমাননা ; নিরুপলক্ষ ; উর্ধ্বগ ; জ্ঞানগোচর ; নৈরাশ্রিসন্ধি ;

শব্দবন্ধগুলো ভাষা সংকোচনের কাজ করে। ‘স্বরূপভাষ প্রকাশশৈলী’র কারণেই শব্দবন্ধ-গুলোর বহুল ব্যবহার প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। ‘স্বোপলব্ধ’ বা ‘স্বাবমাননা’ যদি আলাদা লিখতে হতো তাহলে ‘নিজস্ব উপলব্ধি’ বা ‘নিজের অবমাননা’ লেখা ছাড়া গতান্তর ছিলো না। এসব শব্দ ও শব্দবন্ধই সংহত সংযত প্রকাশশৈলীর জন্য গম্ভব করেছে। গদ্যের ধ্রুপদী মেজাজ এবং যুক্তিসহ স্মৃতি কথকতা নতুন শব্দবন্ধ ও তৎসম শব্দব্যবহারের কল্যাণেই তৈরী হয়েছে। ভাষার গাভীর্য ও সংহতি এবং ধারণক্ষমতা যে কতো বেশী হ’তে পারে সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ভাষাই তার প্রমাণ। তাত্ত্বিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ রচনার উপযোগী গদ্যভাষার অন্যতম উদাহরণ তাঁরই রচনা।

কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যেরকম অব্যয় শব্দের ব্যবহার করেছেন অনায়াসে, তেমনি তাঁর গদ্যের ক্ষেত্রেও অনুয়ের জন্যে অব্যয় শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার লক্ষ্যযোগ্য। এগুলো হচ্ছে :

অগত্যা ; ইত্যাদি ; যেহেতু ; এবং ; অতএব ; সুতরাং ; তথাচ ; কিন্তু ; ফলত ; যদিচ ; কদাচ ; অন্তত ; যদি ; বা ; ও ; আর ; তো ; কেননা ।

তবে অব্যয় শব্দের বহুল ব্যবহার কোথাও কোথাও তাঁর গদ্যকে কিছুটা ভারাক্রান্ত করেছে বলে আমাদের মনে হয়। কয়েকটি উদাহরণ ব্যাপারটাকে স্পষ্ট করবে :

১. অথচ আমার এই অকক্ষিকরতা এক হিসেবে যেমন শোচনীয়, অন্য দিকে তেমনি লাভজনক ; এবং মৌলিকতার দারিদ্র্যই আমাকে ভবিষ্যতের কৃপাকটাক্ষে

বঞ্চিত করবে বটে, কিন্তু বর্তমানের পক্ষে এই জাতীয় রোমন্থনেই আপন জীর্ণ উপজীব্যের উপাদান খুঁজে পাওয়া সম্ভব। অতএব আমার নিষ্কণ্ঠ চিন্তাচৌর্যের অতিমাত্রিক সাজ-সজ্জা অনাবশ্যক; এবং পাঠকমাত্রের মনেই যেহেতু অনুরূপ মতামত উদ্ভূত আছে, তাই আমার যুক্তিজালের অসম্পূর্ণতা তাঁরা স্বগত অন্বীক্ষার সীমানে জুড়ে নিতে পারবেন। [সূচনা, স্বগত]

২. শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে আমার বন্ধু; এবং আমি তাঁর ভক্ত—অন্ধ না হলেও, পক্ষ-পাতী। সুতরাং এ-প্রবন্ধ মোহপ্রবণ; এবং এর বিরুদ্ধে একদেশদর্শিতার অভিযোগ তো ন্যায়সঙ্গত বটেই, এমনকি এতদূশ একচক্ষু বিচার-বিবেচনার সাধকতা হ্রদ্ব তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু বিদূষণ আর কাব্যজিজ্ঞাসার মধ্যেও বিস্তর ব্যবধান; এবং অনুকম্পা কেবল সৌহৃদ্যের শ্রেষ্ঠ সঞ্চল নয়, সংসমালোচক যেকালে সম্ভাব্যতাই অনুকম্পারী, তখন বন্ধুবাৎসল্য বৈদগ্ধ্যের বাধ সাধনা, অনুরাগীর অশোভন উচ্ছ্বাস রসগ্রাহীর উপকারে লাগে। উপরন্তু বিষ্ণু দেব কবিপ্রতিভা অসামান্য ও অভিনব; এবং অপরিণত বয়স থেকেই তিনি যদিও সুপরিণত কাব্য সৃষ্টি ক'রে আসছেন, তবু তাঁর কলাকৌশল, অন্তত বাংলা সাহিত্যে, এ-রকম অপূর্ব যে শ্রদ্ধা ও সম্ভাব ব্যতীত তৎপ্রণীত কবিতাগুলির যথার্থ মূল্যনির্ধারণ অসম্ভব। তবে দরদ যেমন উদীয়মানের পক্ষে লোভনীয়, তেমনি সমবেদনার অভাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠেরও সমূহ ক্ষতি; এবং সমানধর্মীর সাক্ষাৎ আজ না পাওয়া যাক, অচির ভবিষ্যতে নিশ্চয় মিলবে, এই আশাতেই সকল কবি নিরবধিকাল ও বিপুল পৃথিবীর গুণ-গানে শতমুখ।

[“চোরাবালি”, কুলায় ও কালপুরুষ]

৩. অবশ্য জীববিদ্যার নিঃসংশয় বিভাগে জন্তু আর উদ্ভিদই অবগতির প্রধান অবলম্বন; এবং মানুষের মেধা বা মনীষা সম্ভবত অতিজাতব। কিন্তু এও মর্তেরই মহিমা; এবং এর সমস্ত অন্ধি-সন্ধি এখনো আমাদের নখদর্পণে আসেনি ব'লে, একে যদি লোকোত্তর লাগে, তবে না মেনে নিস্তার নেই যে বাণের চাল-চলনও অলৌকিক।

[মনুষ্যধর্ম, কুলায় ও কালপুরুষ]

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সুধীন্দ্রনাথ বাক্য গুরু করেন প্রায়ই অব্যয় শব্দ দিয়ে এবং দীর্ঘ বাক্যের অন্তর সংগঠনের জন্য অব্যয় শব্দগুলো অপরিহার্য হলেও এর ব্যবহার কিছুটা বেশী। বাক্যের প্রায় প্রতিটি খণ্ড অংশের শুরুতেই অব্যয় শব্দের ব্যবহার, বিশেষত ‘এবং’ অব্যয়ের ব্যবহার-বাছল্য কখনো কখনো কানে পর্যন্ত লাগে। বাক্যের শুরুতে ‘এবং’ ব্যবহার অনেকটাই ইংরেজি স্টাইল।

বেশ কিছু বিশেষ্যপদ সুধীন্দ্রনাথের গদ্যে বিশেষণে পরিণত হয়ে বিশিষ্টরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন; অনুকম্পারী, কেবল্য সংকল্পিত, বিষমানুপাতিক, আণুবিক্ষণিক। ইংরেজি শব্দের ব্যবহার তিনি কমই করেছেন। আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগও কম। তবে দাদু, কবুল, তরফ, বাটা-জহরত, সবুর, খাস ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার খুব চমৎকার ও সুপ্রযুক্ত।

বাক্যকাঠামোর ক্রিয়াপদের ব্যবহারজনিত অসামঞ্জস্যতা বাংলা গদ্যের একটা প্রধান দুর্বলতা। ক্রিয়াপদের বহুল ও বাছল্য ব্যবহারই এই গদ্যের এই দুর্বলতার কারণ। বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের স্তর-পরম্পরায় বাক্যগঠনের ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ ব্যবহারের সমস্যা সম্পর্কে কোন লেখকই সম্পূর্ণ সচেতনতা দেখাননি। সুধীন্দ্রনাথই বাংলা গদ্যের সেই রূপকার যিনি ক্রিয়াপদ ব্যবহারের বাছল্য বর্জন ক'রে ভাষাকে সংহত ও প্রগাঢ়

এবং একই ক্রিয়ার পৌনঃপুনিক ব্যবহারজনিত বিরক্তিকর এক্ষেয়েমি থেকে বাংলা গদ্যকে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন। ক্রিয়াপদের বহুল ব্যবহার বর্জন করার জন্য সচেতন এই সাহিত্য-কর্মী নিরন্তর পরিশ্রম করেছেন। ‘উড়ে চলে গেছে’ এই অপরিচ্ছন্ন ক্রিয়াকে উড্ডীন বিশেষণে রূপান্তরের চেষ্টায় সারা সন্ধ্যা কেটে গেছে তাঁর। ২৬ অক্সান্ত পরিশ্রম ও শ্রম-স্ত্রের ফলেই ক্রিয়াপদ ব্যবহারের অপরিচ্ছন্ন রীতিকে গুণে এর স্তমিত ব্যবহার সম্ভব করে তুলেছেন তিনি। ‘হওয়া’ এবং ‘করা’ ক্রিয়াপদের পৌনঃপুনিক ব্যবহারযুক্ত বাক্য, যা অন্যদের রচনায় স্পষ্টচূর, তার হাতে আমরা বেশী পাইনি।

বাক্যের গতি ও চলৎশক্তির জন্যে ক্রিয়ার ব্যবহার অপরিহার্য হলেও এর অতি-ব্যবহার ও একই ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য ব্যবহার বাক্যকে করে বৈচিত্র্যহীন, এক্ষেয়ে ও বিরক্তিকর। প্রাকৃত বাংলায় কৃ-ধাতু ছাড়া আরো বহু ক্রিয়াপদের চল রয়েছে, রবীন্দ্রনাথের মতো সুবীন্দ্রনাথ দত্তও এটা জানতেন। ভাষাকে বেগবান অথচ সংহত সংযত করতে হলে ক্রিয়ার বারংবার ব্যবহার অবশ্য বর্জনীয়।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের তিন কৃতি গদ্যকারের রচনা উল্লেখ করে ক্রিয়াপদের বহুল ও পৌনঃপুনিক ব্যবহারজনিত অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যাক :

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা :

১. বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যাহা পাইয়াছি তাহার পুনরুক্তি করিতেছি।
২. আমরা ননে করিলে এরূপ উদাহরণ অনেক দিতে পারিতাম।
৩. মানুষের এমন দূরবস্থা কখন হইতে পারে না যে, তাহাতে ওত কিছুই দেখা যায় না। আমাদের গুরুতর দুর্ভাগ্যেও কিছু না কিছু অক্ষল ঝুঁজিয়া পাওয়া যায়। ২৭

প্রমথ চৌধুরীর রচনা :

১. সুতরাং তাদের মনোরঞ্জন করতে হলে আমাদের অতি সস্তা খেলনা গড়তে হবে, নইলে তা বাজারে কাটবে না। এবং সস্তা করবার অর্থ খেলো করা। বৈশ্য লেখকের পক্ষেই শূদ্র পাঠকের মনোরঞ্জন করা সম্ভব। সুতরাং সাহিত্যে আর যাই করে না কেন পাঠক সমাজের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা করে না।
২. কবির কাজ হচ্ছে কাব্য সৃষ্টি করা, আর শিক্ষকের কাজ হচ্ছে প্রথমে তা বলা করা, তারপর শব্দেচ্ছদ করা এবং ঐ উপায়ে তার তত্ত্ব আবিষ্কার করা ও প্রচার করা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা :

১. রঘুপতি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পইতা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, “তবে তুমি উচ্ছন্ন যাও।” [রাজষি, তৃতীয় পরিচ্ছেদ]
২. অতএব চিরকাল যদি মানুষ আপনার কোন জিনিস মানুষের কাছে উজ্জ্বল নবীনভাবে অমর করিয়া রাখিতে চায়, তবে তাহাকে ভাবের কথাই আশ্রয় করিতে হয়। [সাহিত্যের সামগ্রী]

তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা সর্বত্র এরকম ক্রিয়াপদ কণ্ঠকিত নয়। প্রথম দিককার রচনার ক্রিয়াপদের অতি-ব্যবহার অচিরে কাটিয়ে উঠেছেন এবং মধ্যপর্ষায়ের লেখায় এ দিক থেকে রীতিমতো সজাগ ও সচেতন তিনি। ‘ক্রিয়াপদের হ্রস্বতার দিকেও রবীন্দ্রনাথ ‘চতুরঙ্গ’ (১৯১৬) উপন্যাসে সজাগ ও নিরীক্ষাধর্মী।’ ২৮ যেমন :

শচীশের একি চেহারা! প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপটা-খাওয়া ছেঁড়া-পাল ভাঙা-মান্ডুল জাহাজের মতো ভাবখানা। চোখদুটো কেমনতরো, চুল উক্কো-খোক্কো, মুখ বোগা, কাপড় ময়লা। [দামিনী, ‘চতুরঙ্গ’]

ক্রিয়াপদের সংখ্যা হ্রাসের উদাহরণ ‘শেষের কবিতা’ (১৯২৯) উপন্যাসেও উপস্থিত। যেমন :

‘ওর মুগাঙ-বিকীর্ণ ইংরেজি ভাষার উচ্চারণটা বিজড়িত, বিলম্বিত, আমীলিত চক্ষুর অলস কটাক্ষ-সহযোগে অনতিব্যক্ত; যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছে শোনা যায়, ইংলণ্ডের অনেক নীলরক্তবান আমীরদের কণ্ঠস্বরে এইরকম গদগদ জড়িমা। এর উপরে ষোড়দোড়ীয় অপভ্রাষা এবং বিলিতি শপথের দুর্বাক্য সম্পদে সে তার দলের লোকের আদর্শপুরুষ।’ [২৪ : ধুমকেতু, শেষের কবিতা]

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়কার এইসব রচনার উদাহরণ থেকে স্পষ্টত ধারণা করা সম্ভব যে তিনি ক্রিয়াপদের ব্যবহার বিষয়ে ছিলেন সজাগ ও মনোযোগী। তবু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার বিষয়ে আগাগোড়া যেরকম শুদ্ধ সচেতনতা ও সূর্যু প্রয়োগ-কৌশল দেখিয়েছেন সে রকমটা অন্য গদ্যকারদের রচনায় অনুপস্থিত। ক্রিয়াপদের এই ব্যবহার সচেতনতা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্যরীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাঁর রচনায় ক্রিয়াপদের ব্যবহার-স্বল্পতা বিস্ময়কর। যেমন :

১. রবীন্দ্রনাথ হাল বাংলার সিদ্ধিদাতা গণেশ। তিনি তো আমাদের উৎসব-অনুষ্ঠানের সূত্রধার বটেই, এমন কি তাঁর বাণী-বাতিরেকে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যেও লাভ নেই। কারণ রবীন্দ্রপ্রতিভা মুখ্যত ভাবয়িত্রী হলেও, কারয়িত্রী পরিকল্পনাতেও তিনি অদ্বিতীয়; এবং শিল্পের সর্ববিধ বিভাগেই তাঁর সাফল্য যেমন বিস্ময়াবহ, তেমনই বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনেও তাঁর দান সুস্পষ্ট। [সূর্যাবর্ত, কুলায় ও কালপুরুষ]

২. শরীরবৃত্তে ক্ষুধা অস্ত্রের প্রসার-সংকোচ-মাত্র, এবং এ-কথা দেহান্তবাদীরও স্বীকার্য যে উক্ত প্রক্রিয়া গবেষকের বোধগম্য বটে, কিন্তু বুড়ুকার ব্যক্তিগত অনুভব একেবারে আলাদা জাতের। উপরন্তু একজন জড়বাদী বৈজ্ঞানিকই দেখিয়েছেন যে শিক্ষার ওণে বেদনার স্বভাবসিদ্ধ প্রবর্তনা বদলানো আদৌ শক্ত নয়, বরঞ্চ সমাজভুক্ত মানুষের পক্ষে তার অন্যথাই অভাবনীয়; এবং সেই জন্য ক্ষুধার মতো মৌল অভিজ্ঞতা সুদ্ধ সংস্কারসংক্রমিত। অবশ্য অনেক দার্শনিক ও অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীর মতে সামান্যের উপলব্ধি অসম্ভব; এবং সংস্কার যদিও গোপ্তগত, তবু অনুভূত সংস্কার স্পষ্টতই প্রাতিস্মিক। [ভূমিকা, অর্কেস্ট্রা]

৩. তলিয়ে না দেখলে, এমন বিশ্বাসও বোধ হয় পোষণীয় যে আমার সাহিত্যাদর্শে পাশ্চাত্যপ্রভাবের আধিক্য দেশদ্রোহের সাক্ষ্য; এবং এক অনুকম্পায়ীর বিচারে আমার স্থানান্তরিত পদ্যরচনা, অদ্ভুত মূদ্রাদোষ সত্ত্বেও, নিঃসংশয়ে ভরতবংশীয় বটে, কিন্তু আমার সংস্কৃত-সম্বল গদ্যের গোড়ী পদপাত বাংলার মাটি ভুলেও মাড়ায় না। [পুনশ্চ, স্বগত]

সুধীন্দ্রনাথ-রচিত উপর্যুক্ত তিনটি উদাহরণের প্রথমটিতে একটি, দ্বিতীয়টিতে একটি এবং তৃতীয়টিতে দু'টিমাত্র ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত। ক্রিয়াপদের পরিমিত ব্যবহার তাঁর গদ্যকে একযোগেই থেকে রক্ষা করেছে। এর পৌনঃপুন্য ব্যবহার বর্জনে সচেতন ছিলেন বলেই তাঁর রচনা সংহত এবং স্বাপত্যধর্মী। সংহত হওয়া সত্ত্বেও সুধীন্দ্রনাথের গদ্য স্বচ্ছন্দ এবং হৃদয়বিরতর অভিশাপ প্রায় কখনো তাঁকে স্পর্শ করেনি।

সুধীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা প্রথাসম্মত ও নিয়মানুবর্তী এবং তাঁর স্বকীয় রচনায় অসংযম ও অস্বচ্ছতার চিহ্ন নেই। যুক্তির তীক্ষ্ণ ঋজু পথে এগুলেও তাঁর ভাষাভঙ্গি অনেকটা তির্যক রীতিকে অঙ্গীকার করেছে। বাকুরীতির এই তির্যক দিকটির সঙ্গে মিশেছে কিছুটা ব্যঙ্গপ্রবণতা। তবে ব্যক্তিস্বরূপের ঋজুতা বাক্তঙ্গিকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করেছে বলে ব্যঙ্গপ্রবণতা খুব একটা প্রতিষ্ঠা পায়নি। তির্যক রীতির উদাহরণ :

১. আসলে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ক'রে যারা স্বাতন্ত্র্য খোঁয়ায়, হয় তাদের তিতরে ব্যক্তিস্বরূপের বলাই নেই, নয় তারা কার্যকরী প্রতিভায় বঞ্চিত।

[দোটানা, স্বগত]

২. এবং তাঁর [রবীন্দ্রনাথের] চেষ্টায় সমগ্র বাংলা ভাষার প্রকাশক্ষমতা এতখানি বেড়ে গেছে যে আজকালকার হৃদয়বান বাঙালীরা প্রায় সকলেই সাহিত্যিক।

[রবিশ্যাম, কু. কা.]

৩. আমি অবৈজ্ঞানিক মানুষ; এবং হয়তো সেই জন্যে ওই ধরনের মৌল ব্যাখ্যায় আমার অবিদ্যা কাটে না, মন হাস্যমুখর হয়ে ওঠে। [ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ, কু. কা.]

৪. বিধাতা বাঙালীর এতখানি দুর্দশা লেখেননি বটে, কিন্তু পয়ারের পদ্যমধু খেয়ে বঙ্গভারতীও কম বিপদে পড়েননি। তবে দেবীর পূণ্যবল বোধহয় অশেষ; তাই পরদেশী প্রচারকদের প্ররোচনায় একদিন হঠাৎ এক নূতন কালাপাহাড় সদর্পে মন্দিরে ঢুকে সরস্বতীকে বনেট্ পরিয়ে দিলেন; এবং পৌষাকের এমনই গুণ যে সঙ্গে সঙ্গে পাষাণীর নিঃসাড় দেহে যাবনিক চাপলোর ছিলোল উঠল।

[পূর্বোক্ত, কু. কা.]

সুধীন্দ্রনাথের বাকুরীতি তাঁরই বিশিষ্ট ব্যক্তিস্বভাব ও পৌরুষদীপ্ত প্রতিভার স্বাক্ষর। সংস্কৃত শব্দ ও অপূর্ণালিত শব্দব্যবহার সত্ত্বেও তাঁর বাক্য পদের বিশেষ সংস্থাপন কৌশল, শব্দগত অর্থ-সঙ্গতি এবং ঋজু উচ্চারণরীতির জন্যে একধরনের স্বনিপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। উপরে উদ্ধৃত শেষতম বাক্যটিতে 'পয়ারের পদ্যমধু' এবং 'পরদেশী প্রচারকদের প্ররোচনায়' কথাগুলি চমৎকার শব্দালাংকার। এ ধরনের শব্দালাংকারের উদাহরণ তাঁর গদ্যের শিল্পসাক্ষ্য সসৃদ্ধ করেছে। গদ্যেও যে একধরনের গতিচ্ছন্দ সৃষ্টি হতে পারে এগুলো তারই উদাহরণ। কাব্যধর্মী বাক্যও তাঁর গদ্যে দুর্লভ নয়। যেমন :

তার প্রতিশ্রুত নন্দনের পথ বারংবার মরুর প্রান্তরে দিশা হারিয়েছে, জনপদের কুহকে গন্তব্য ভুলেছে, দেবতাকে ছেড়ে অনুসরণ করেছে অপদেবতার।

[কাব্যের মুক্তি, স্বগত]

এই পংক্তির পদ-সংস্থানকে ইচ্ছে করলেই কবিতার পংক্তিতে সাজিয়ে নেয়া চলে। এর অন্ত-ছন্দোৎপাদ ও স্বনিষ্পন্দন পাঠকের চেতনায় আলোড়ন তোলে। তবে গদ্যের

ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কখনো আবেগের কাছে মাথা নত করেননি এবং গভীর বক্তব্য ও দার্শনিক প্রত্যয়ের প্রকাশক্ষেত্রে লঘু-তরল উচ্চারণে ভাষার গাভীর্য স্ফুট করেননি।

সুধীন্দ্রনাথের প্রকাশভঙ্গি প্রায় সর্বত্রই শিল্পিত। উপমা ও প্রতীক প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি গদ্যসাহিত্যে অনন্য। তাঁর উপমা প্রকৃতির চাইতে বস্তুজগৎ থেকেই প্রধানত আহরিত। প্রতীক-উপমার কিছু উদাহরণ:

১. সেই আসুরিফ নিষাদ আবার দৈব রোষে অন্ধ ও অশরীরী ; এবং সেই জন্যে তাঁকে মৃগয়াবিরত দেখে লক্ষ্যভেদে নিজের অক্ষমতা আমি বিনা সংকোচে মেনে নিয়েছি। [মুখবন্ধ, কু. কা.]

২. ফলত পিরিলিরা এই অজুহাতে হিন্দুসমাজ থেকে বহির্ভূত হয়েছিলেন যে তাঁদের ধন-সম্পত্তি অকথ্য কালাপাহাড়ির পুরস্কার ; [রবীন্দ্রপ্রতিভার উপক্রমণিকা, কু. কা.]

৩. কারণ এই প্রকাশভঙ্গি জীবনের মতোই পরিবর্তনশীল, এর বিশ্বব্যাপ্তি বায়ুর অনুকারী, ক্ষুধায় এ সর্বভুক অগ্নির তুল্য। [ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ, কু. কা.]

৪. রবীন্দ্রনাথ হাল বাংলার সিদ্ধিদাতা গণেশ। [দূর্য্যাবর্ত, কু. কা.]

৫. কবিও ভগবানের মতো পাঠককে একটা চক্রচরণের নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত ; এবং দৈবানুপ্রাণিত মানুষের মতোই পাঠকও এক জায়গা থেকে বেরিয়ে, আবার ফিরে আসে সেইখানেই। [ঐতিহ্য ও টি. এস. এলিয়াট, স্বগত]

সমালোচক ও পাঠকমহলে সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ দুরূহ অভিধা পেয়েছে এবং আপাত দুরূহতার কারণে তাঁর গদ্য লোকপ্রিয় হয় নি। ‘স্বগত’-এর প্রথম সংস্করণের অপ্রত্যাশিত কাটতি দেখে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ‘বাংলার মনীষা আসলে স্বভাব নিপুণ নয়।’ ২৯ তবু একথা সত্যি যে সুধীন্দ্রনাথের গদ্যরচনায় সাধারণ পাঠককূল খুব স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন না। তাঁর আঙ্গিক এতো নিরেট এবং প্রকাশভঙ্গি এতোটা স্থাপত্যধর্মী যে বাঙালি পাঠকের চিলে-ঢালা চেতনা-চৈতন্যে তা সহসা তরঙ্গ তোলে না। নিরন্তর সাধনায় যে সিদ্ধি সুধীন্দ্রনাথ অর্জন করেছেন আয়াস-লব্ধ আয়োজনে তার মর্ম উন্মোচন করবেন এতোটা ধৈর্য বাঙালি পাঠকের কোন কালেই ছিলো না। পাঠকের মনন ও অভিনিবেশ দাবী করে তাঁর রচনা। তাঁর তির্যক বাক্যরীতিও অলস পাঠকের অপরিচ্ছন্ন মেধার বাইরে।

বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের এক অনন্য রচনারীতির জন্মদাতা সুধীন্দ্রনাথের বাক্যবিন্যাস ও অর্থপ্রকাশের মৌলিক উপায় সাধারণ পাঠকের কাছে দুরূহ ঠেকেতেই পারে। লেখকের মেধা মনন ও প্রজ্ঞার সবটাই যে ভাষার রূপকাঠামো নির্মাণে সহায়ক হয়েছে তা সর্বজনপ্রিয় না হতে পারে, ঠেকেতে পারে দুরূহ, কিন্তু ভাবনা ও অভিপ্রায় প্রকাশের পক্ষে তা অপরিহার্য। সুধীন্দ্রনাথের ভাষা স্থাপত্যধর্মী ধ্রুপদী হলেও তার স্থিতিস্থাপকতা অসাধারণ। তাতে দুরূহ ভাবও প্রকাশের বশ মানে। তাঁর ধ্রুপদী গদ্য যে সাধারণের সাধুবাদ পায়নি, এর কারণ শিল্পশুদ্ধি মূলত ঐকান্তিক প্রয়াসের পুরস্কার এবং পাঠক কণ্ঠস্বীকারে পরান্মুখ। দুরূহতা প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের মন্তব্য : ‘দুরূহতার দুটো দিক আছে, একটা পাঠকের দিক ও অন্যটা লেখকের। যে দুরূহতার জন্য পাঠকের আলস্যে তার জন্য কবির উপর দোষারোপ অন্যায্য।’ ৩০ আগ্রহ অভিনিবেশ ও অনুশীলন ছাড়া যদি দর্শন বিজ্ঞান বা গণিত বুঝতে অসুবিধে হয় তাহলে শ্রেষ্ঠ কাব্য বা মননশীল গদ্য বুঝতেও

অনুশীলনের প্রয়োজন অবশ্যস্বাভাবী। লেখকের দুরূহতা বিষয়ে সুধীন্দ্রনাথকে অভিযুক্ত করা চলে না। বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন ফাঁক রাখেননি তিনি এবং যুক্তির ধারেও কোন ম্লানতার স্পর্শ পৌঁছেনি। ভাষার কারুকর্ম প্রকাশ করতে গিয়ে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরের চোরাবালিতে তাঁর ভাবনাকে ডুবতে দেখি না কখনো। তবে একথাও সত্যি যে মনস্বী ও মেধাবী, পণ্ডিত ও বিশ্লেষণীবুদ্ধির অধিকারী সুধীন্দ্রনাথের সমকক্ষ পাঠকও অত্যন্ত কম।

সাহিত্য-সৃষ্টি মূলত জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের অবিরাম সংগ্রাম; এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আত্মত্ব সেই মহত্তর সংগ্রামে নিয়োজিত রেখেছিলেন নিজেকে। তাঁর সংগ্রামলব্ধ সাহিত্য-সম্পদ সর্বত্রই হীরের ওজ্জ্বল্য পেয়েছে।

পরিশিষ্ট

[ক] তথ্য-নির্দেশ

- ১ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : জন্ম, ৩০ অক্টোবর ১৯০১, কলকাতা। মৃত্যু : ২৫ জুন, ১৯৬০
- ২ ভূমিকা, 'অর্কেস্ট্রা'। "সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ"। প্রথম ভারি সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৭৩, অক্টোবর ১৯৬৬। ২৬, কলেজ স্ট্রিট কলকাতা-১২। পৃ. ৮ "আমি অন্ধকারে বন্ধমূল, আলোর দিকে উঠছি। সদগতির আগেই হয়তো তমসায় আবার তলাব।"
- ৩ মুখবন্ধ, 'কুলায় ও কালপুরুষ' : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। প্রথম সংস্করণ, আঘাট ১৩৬৪। সিগনেট প্রেস, ১০/২ এলগিন রোড, কলকাতা-২০। পৃ. 'ক'
- ৪ মুখবন্ধ, 'সংবর্ত'। "সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ"। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২
- ৫ ভূমিকা, বুদ্ধদেব বসু : 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ', পূর্বোক্ত। পৃ. 'ছয়'
- ৬ 'কালের পুতুল', বুদ্ধদেব বসু, পৃ. ১৮২
- ৭ 'বাঙলা গদ্যরীতি', মুনীর চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৩৮৩ (জুলাই ১৯৭৬) বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ৩
- ৮ 'বাঙলা গদ্যরীতি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪
- ৯ 'সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' : সত্যেন্দ্রনাথ রায়। পৃ. ৫৬
- ১০ 'বাঙলা সাহিত্যে গদ্য', শ্রীস্বকুমার সেন, ৪র্থ সংস্করণ ১৩৭৩, ইন্সটার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা। পৃ. ১৪৫
- ১১ 'কুলায় ও কালপুরুষ' : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪-২৫
- ১২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯
- ১৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭
- ১৪ *Origin and Development of Bengali Language* : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
- ১৫ *An Acre of Green Grass* : : বুদ্ধদেব বসু ['আধুনিক সাহিত্যচর্চা', আবদুল হাফিজ-(প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৮২, মুক্তধারা প্রকাশনী)-এর গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃ. ১২]

- ১৬ সূচনা, 'স্বগত', সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। প্রথম সিগনেট সংস্করণ (দ্বিতীয় সংস্করণ) আষাঢ় ১৩৬৪। পৃ. ১১
- ১৭ পুনশ্চ, 'স্বগত', সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮
- ১৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯
- ১৯ 'বাক্সালা সাহিত্যে গদ্য': স্বকুমার সেন। চতুর্থ সংস্করণ ১৩৭৩। প্রকাশ, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ৮-সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। পৃ. ১৪৯-১৫১
- ২০ *Selected Prose* : T. S. Eliot. Reprinted 1965. Penguin Books. In associated with Faber and Faber [From After strange Gods 1934]p. 20
- ২১ 'স্বগত': সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫
- ২২ 'শব্দের সীমানা': জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মুক্তধারা, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬, পৃ. ৪০
- ২৩ ভূমিকা, 'প্রতিধ্বনি': "সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ"; পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩১
- ২৪ 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়': দীপ্তি ত্রিপাঠী; পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৭৪, পৃ. ২১১
- ২৫ 'স্বগত': সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১
- ২৬ ভূমিকা। অর্কেস্ট্রা: "সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ"। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪। "যারা ভাবতে অভ্যস্ত যে কাব্য প্রেরণা বা অভিজ্ঞতার লীলাভূমি, তাদের বিচারে কলা-কৌশল স্বাচ্ছন্দ্যের জ্ঞানশূন্য। এমন কি রবীন্দ্রনাথের মত সাধকপুরুষও অনুরূপ বিশ্বাস ছাড়তে পারেননি। এবং একদিন 'উড়ে চলে গেছে' এই অপরিচিন্তা ক্রিয়ার 'উড্ডীন' বিশেষণে রূপান্তরের চেষ্টায় আমাকে সারা সন্ধ্যা কাটাতে দেখে তিনি খুশী হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাবধান করেও দিয়েছিলেন যে যদি ওই ভাবে অত আস্তে আস্তে লিখি, তবে আমার কলম অচিরে থেমে যাবে।"
- ২৭ "বন্ধিম রচনাবলী": ২য় সংস্করণ, সাহিত্য সংসদ, ৪র্থ মুদ্রণ ১৩৭৬। [১.২] প্রবন্ধ: 'বাক্সালীর উৎপত্তি' পৃ. ৩৬১, ৩৬০। [৩] 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' পৃ. ২৪১
- ২৮ 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস চেননালোক ও শিল্পরূপ': সৈয়দ আকরম হোসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৮৮ প্রথম সংস্করণ। পৃ. ৩৩৮
- ২৯ 'স্বগত': সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯
- ৩০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

[খ] সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ: (রচনাকাল-অনুসারে)

- ১ 'স্বগত': দ্বিতীয় (পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত) সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৬৪। প্রকাশক: শ্রীদিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০/২ এলগিন রোড, কলকাতা-২০। প্রথম সংস্করণ ১৩৪৫। ভারতীভবন, ১১ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা থেকে শ্রীকৃষ্ণভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক প্রকাশিত। উৎসর্গ: "ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের করকমলে"।
- ১৯৩০ - কাব্যের মুক্তি
- ১৯৩২ - ধ্রুপদ-খেয়াল
ডি. এইচ. লরেন্স ও ভার্জিনিয়া উল্ফ
- ফরাসীর হার্দ্য পরিবর্তন
- লিটন স্ট্রেট

- ১৯৩৩ -- উপন্যাসে তত্ত্ব ও তথ্য
 ১৯৩৪ -- উইলিয়ম্ ফক্‌নর
 -- ঐতিহ্য ও টি. এন্স. এলিয়ট্
 ১৯৩৫ -- উইগ্‌ম্ লুইস্ ও এজা. পাউণ্ড্
 ১৯৩৬ -- বার্ণার্ড শ
 -- ডব্লু. বি. য়েট্‌স্ ও কল্টেকবল্য
 ১৯৩৭ -- মাক্সিম্ গর্কি
 -- দোচিনা
 -- জেরার্ড্ ম্যান্‌লি হপ্কিন্স্
 ১৯৩৮ -- সুচনা
 ১৯৪০ -- গুরুচণ্ডাল
 ১৯৫৬ -- পুনশ্চ

২ **ক্লায় ও কালপুরুষ:** প্রথম সংস্করণ আঘাট ১৩৬৪। প্রকাশক শ্রীদিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০/২ এলগিন রোড, কলকাতা-২০। উৎসর্গ: “আমার প্রথম শ্রোতাদের মধ্যে যিনি সহ্যগুণে ও অনুকম্পায় অদ্বিতীয় সেই ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের শ্রীকরকমলে”।

- ১৯৩২ -- মনুষ্যধর্ম
 ১৯৩৩ -- ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ
 -- “বাংলা ছন্দের মূলসূত্র”
 ১৯৩৪ -- অদ্বৈতের অত্যাচার
 ১৯৩৫ -- “অস্তঃশীলা”
 ১৯৩৬ -- সূর্যাবর্ত
 ১৯৩৭ -- “চোরাবালি”
 -- শিল্প ও স্বাধীনতা
 -- বিজ্ঞানের আদর্শ
 -- উদয়ান্ত
 ১৯৩৮ -- ভিক্টোরীয় ইংলণ্ড
 -- প্রগতি ও পরিবর্তন
 ১৯৩৯ -- রবীন্দ্রপ্রতিভার উপক্ৰমণিকা
 -- অনার্য সভ্যতা
 ১৯৪০ -- রবিশস্য
 -- আঠারো শতকের আবহ
 ১৯৪১ -- দিনান্ত
 -- পিতাপুত্র
 ১৯৪৬ -- উক্তি ও উপলক্ষি
 ১৯৫৭ -- মুখবন্ধ

[গ] অন্যান্য গদ্যরচনা

- জ্যৈষ্ঠ ৩১, ১৩৩৭ -- ভূমিকা, ‘তন্বী’
 অগস্ট ১, ১৯৫৩ -- ভূমিকা, ‘অর্কেস্ট্রা’
 মে ৩১, ১৯৫৩ -- মুখবন্ধ, ‘সংবর্ত’
 জুলাই ১১, ১৯৫৪ -- ভূমিকা, ‘প্রতিধ্বনি’